ধারাবাহিক রচনা

সৎসঙ্গরত্নাবলি

স্বামী ধীরেশানন্দ

(জুলাই ’১৮ সংখ্যার পর)

[শ্রীমৎ স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজের ‘সৎসঙ্গরত্নাবলি’ নামে সংকলনটি ‘নিবোধত’ পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন আমেরিকার সেন্ট লুইস বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ। উত্তরাখণ্ডের কয়েকজন উচ্চকোটির সাধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁদের উচ্চ চিন্তারাজি এই সংকলনের আলোচ্য বিষয়। বর্তমান সংখ্যায় কনখলের মহাত্মা স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজের উপদেশাবলি সংকলিত হয়েছে।]

বৃত্তি ও ক্ষণিক

সব জ্ঞান বা বৃত্তিই ক্ষণিক। কারণ সব পদার্থই ক্ষণপরিণামী। বৃত্তির কাজ আবরণনিবৃত্তি। সেটি প্রথম ক্ষণেই হয়। দ্বিতীয়াদি ক্ষণের বৃত্তি আর আবরণ ভঙ্গ করে না। তবে যদি সংশয় থাকে তাহা হইলে পুনরায় বৃত্তিদ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে আবরণভঙ্গের প্রয়োজন আছে। যদি প্রথম ক্ষণের বৃত্তি দ্বারাই আবরণভঙ্গ হইয়া যায় তবে আর বৃত্তির কী প্রয়োজন? অন্ধকারে একটা দড়ি পড়িয়া আছে। অনেকে মনে করিতেছে সেটা সাপ। যদি হাওয়ায় নিভাইয়া না দেয় তবে দিয়াশলাইয়ের একটি কাঠি জ্বালিলেই আবরণ (অন্ধকার) নিবৃত্তিপূর্বক রজ্জুজ্ঞান হইয়া যায়। আর কাঠি জ্বালাইবার কী প্রয়োজন? যদি প্রথম কাঠিটা হাওয়ায় নিভিয়া যায় তবে আরও কাঠি জ্বালানো দরকার। তেমনি সংশয়রহিত এক ক্ষণিক বৃত্তিতেই যদি অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গ হয় তবেই জ্ঞান হইল, আর বৃত্তির কী প্রয়োজন?

তবে যদি ইচ্ছা হয় ও স্বভাববশে জ্ঞানী আবার বৃত্তির অভ্যাস, সমাধির অভ্যাস করেন সে আলাদা কথা। সেটা তাঁহার কর্তব্য বলিয়া নয়। সেটা তাঁহার প্রারব্ধ, তাঁহার ইচ্ছা।

এক ক্ষণের জন্য অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেও তিনি পূর্ণজ্ঞানী। আর দীর্ঘকাল ধরিয়া ওই বৃত্তিধারা হইলেও তিনি সেই পূর্ণজ্ঞানী। প্রথম জন দ্বিতীয়কে বড় মনে করিয়া খেদ করেন না। দ্বিতীয়ও প্রথমকে ছোট মনে করিয়া গর্ববোধ করেন না।

যেমন কোনও পিতার দুই পুত্র। দুজনকেই সমভাবে পিতা বিষয় ভাগ করিয়া দিয়াছেন। দুজনেই ধনী। একজন তাহার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া সুদের টাকায় পূর্বের ন্যায়ই জীবনযাপন করিতে লাগিল। আর একজন তাহার টাকায় বড় বাড়ি কিনিয়া দাসদাসী রাখিয়া আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল। যাঁহার ক্ষণেকের জন্য অপরোক্ষবৃত্তি হইয়াছে তিনি যেন ওই ব্যাঙ্কে টাকা রাখা প্রথম

লোকটির ন্যায়। আর ভূম্যারূঢ় বা সমাহিত জ্ঞানী যেন তাহার মতো—যে বাড়ি কিনিয়া আনন্দে জীবন কাটাইতেছে।

মূল খুঁজিয়ো না

‘মধ্ ভারত অনে কস্তুরী।/ যোগী বেশ্যা অনে তপেশ্বরী॥’—মধু, মহাভারত, কস্তুরী, যোগী, বেশ্যা এবং তপস্বী—ইহাদের মূল অনুসন্ধান করিতে নাই। কোথা হইতে আসিল, কাহার পুত্র বা কন্যা—এইসবের দরকার নাই। কেবল গুণটিই গ্রাহ্য। এটি একটি গুজরাতি প্রবাদ।

আনন্দ

‘যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
দ্বাবেতৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥’
(ভাগবত)

জীব মূঢ়তম হয় সুষুপ্তিতে। ইহা মহা অজ্ঞানাবস্থা। আর ‘বুদ্ধেঃ পরংগতঃ’—ইহা সমাধি অবস্থা। এই দুই অবস্থাতেই মানুষ আনন্দ অনুভব করে। মধ্যে অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতেই মানুষ দুঃখ অনুভব করে। সুষুপ্তি আর সমাধিতে যে-আনন্দ উহা একই ব্রহ্মানন্দ। সুষুপ্তিতে ‘ইহা ব্রহ্মানন্দ’ এরূপ লোক জানে না, কাজেই উহা অজ্ঞাত আর সমাধির আনন্দ জ্ঞাত—ইহাই পার্থক্য। গঙ্গাজল কেহ জানিয়া পান করিতেছে আর কেহ না জানিয়া পান করিতেছে—কিন্তু একই হইল। যোগীরা নির্বিকল্প সমাধিতে যে-আনন্দ অনুভব করে তাহাও স্বরূপানন্দ। কিন্তু তাহারা উহাকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়া জানে না কারণ ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক সংস্কার তাহাদের নাই। উহাও ব্রহ্মানন্দই। কিন্তু জানে না বলিয়া তাহাদের মুক্তি হয় না।

সব আনন্দ ভোগকালেই জীব এক ক্ষণের জন্য হইলেও নির্বিকল্প সমাধিস্থ হয়। (প্রমাণ—“পুণ্যস্যানুভবে বিভাতি কৃতিনামানন্দরূপঃ স্বয়ং/ সর্বো নন্দতি যত্র সাধু তনুভৃন্মাত্রঃ প্রযত্নং বিনা।” *বিবেকচূড়ামণি*) কিন্তু ইহা জীব জানে না। কোনও আনন্দই ‘জন্য’ নহে। ব্রহ্মানন্দই বিষয়কে উপলক্ষ্য করিয়া প্রতিভাত হয়। তাই লোকে আনন্দ বিষয়গত বলিয়া মনে করে। আনন্দের অভিব্যঞ্জক বৃত্তি, জন্য বটে। কিন্তু আনন্দ জন্য নহে।

নির্বিকল্প সমাধিতে বিষয়ের সামান্য পরিচয়মাত্র হয়। ত্বং পদার্থের বোধ হয়। তৎপর মহাবাক্য দ্বারা জ্ঞান হয়।

ভাল ও মন্দ পুস্তক

যে-পুস্তক পড়িলে মন অন্তর্মুখ হয় তাহাই ভাল (মুমুক্ষুর পক্ষে)। আর যে-বই পড়িলে চিত্ত বহির্মুখ হয় তাহা নিকৃষ্ট। ‘বিচারসাগর’ এই দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট পুস্তক আমি বলি। আর ‘বৃত্তিপ্রভাকর’ নিকৃষ্ট পুস্তক, কারণ উহাতে কেবল খণ্ডন-মণ্ডন। ওই পুস্তকপাঠে চিত্ত বহির্মুখ হয়।

বিদ্যারণ্যের প্রারব্ধ

বিদ্যারণ্যের গুরু শংকরানন্দ আসিয়া দেখেন যে তাঁহার শিষ্য বিদ্যারণ্য শৃঙ্গেরী মঠাধীশ হইয়া প্রচুর ঐশ্বর্যমাঝে সমাসীন। গুরু বলিলেন, “এসব কী? সন্ন্যাসী নিবৃত্তিপরায়ণ হয়ে থাকবে। চলো আমার সঙ্গে জঙ্গলে।” বিদ্যারণ্যও উচ্চবাচ্য না করিয়া গুরুর সঙ্গে চলিলেন। যাইবার আগে কোনও কর্মচারীকে বলিয়া যাইলেন যে তাঁহারা রাত্রে যেখানে জঙ্গলে ঘুমাইবেন সেখানে তাঁহার পার্শ্বে সে যেন একটি রূপার জলের লোটা ও মাথার নিচে একটি মূল্যবান তাকিয়া রাখিয়া দেয়। কর্মচারী তাহাই করিল। ভোরে উঠিয়া শংকরানন্দ দেখেন সেখানেও ঐশ্বর্য। তিনি বিদ্যারণ্যকে বলিলেন, “এখানে এসব কী?” বিদ্যারণ্য উত্তর দিলেন, “গুরুদেব! আমার প্রারব্ধই দেখছি এরূপ।” তখন শংকরানন্দ বলিলেন, “তাহলে তুই যা। তোর জন্য এই নিবৃত্তির জীবন

নয়।” বিদ্যারণ্য মঠে ফিরিয়া গেলেন ও মঠাধীশের কাজ করিতে লাগিলেন। জ্ঞানীর ব্যবহারের কোনও নিয়ম নাই। উহা প্রারব্ধের অধীন। জ্ঞানীর নিবৃত্তিপরায়ণ জীবন সমর্থন করিয়া বিদ্যারণ্য অতঃপর ‘জীবন্মুক্তিবিবেক’ গ্রন্থ লেখেন।

শংকরানন্দের ‘গীতার টীকা’, বিদ্যারণ্যের ‘জীবন্মুক্তিবিবেক’ ও মহাদেবানন্দ সরস্বতীকৃত ‘তত্ত্বানুসন্ধান’—এই তিনটি এক শ্রেণীর পুস্তক।

জন্মমৃত্যু

জন্মমৃত্যু জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কাহারও নাই। সবই আবিদ্যক। এক বানিয়া ব্যবসা করিতে বিদেশে যাইবে। কয়েকটি গাধাভর্তি মাল লইয়া যাইতেছে। দুপুর রোদে এক গাছতলায় মাল নামাইয়াছে। নিজে রুটি খাইবে। গাধাগুলি না পালায় তাই তাহাদের পিছনের পা দুইটি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে, যাহাতে ঘাসও খাইতে পারে, আর পালাইতেও না পারে। লাফাইয়া লাফাইয়া চলিবে। শেষ একটা গাধার পা বাঁধিবার দড়ি নাই। তাই গাধাটাকে হাতে ধরিয়া রাখিয়াছে আর ভাবিতেছে কী করা যায়। একজন সাধু তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে ওইরূপে গাধাটিকে ধরিয়া কী ভাবিতেছে। বানিয়া বলিল, ‘‘মহারাজ! দড়ি নেই যে গাধাটার পা দড়ি দিয়ে বাঁধব। ছাড়তেও পারছি না কারণ তাহলে পালাবে। আর এ-অবস্থায় রুটিই বা খাই কী করে?”

সাধু বলিলেন, ‘‘এক কাজ করো। গাধাটার পা যেন দড়ি দিয়ে বাঁধছ এরূপ ঝুটমুট ভান করো।” বানিয়া তাহাই করিল। পা বাঁধা হইয়াছে মনে করিয়া গাধা লাফাইয়া লাফাইয়া চলিল ও ঘাস খাইল। যাইবার সময় বানিয়া অন্য সব গাধার পায়ের বাঁধন খুলিয়া মাল চাপাইয়া রওনা হইল। শেষ গাধাটিকেও মাল চাপানো হইয়াছে, কিন্তু সে তিন পায়ে লাফাইয়া চলিতেছে। বানিয়া ভাবিল, এ কী হইল! সাধু কি গাধাটিকে কোনও জাদুটোনা করিয়াছে নাকি? সাধুকে বলায় তিনি বলিলেন, ‘‘ওর পায়ের বাঁধন খুলে দাও।” বানিয়া বলিল, ‘‘ওকে বাঁধলুম কোথায় যে খুলে দিব?” সাধু বলিলেন, ‘‘যেমন ঝুটমুট বেঁধেছিলে তেমনি ঝুটমুট খুলে দাও।” বানিয়া তাহাই করিল। তখন গাধা ঠিক চলিতে লাগিল। জীবের বন্ধন, জন্মমৃত্যুও এইরূপ। বস্তুত বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। তবু জীব মনে করে যে এই সবই রহিয়াছে। বস্তুতে কোনও বিরোধ নাই। জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের বিরোধ অর্থাৎ প্রমা জ্ঞানের সঙ্গে ভ্রান্তি জ্ঞানের বিরোধ।

পূর্ব স্বভাব

এক রাজা। তাঁহার রানি এক জায়গায় বসিয়া খান না। নানাস্থানে মিষ্টদ্রব্যাদি রাখিয়া দেন আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া খান। রাজা ভাবিলেন—এ কী ব্যাপার! মন্ত্রী বলিলেন, ‘‘ইনি নিশ্চয়ই দরিদ্রের কন্যা।” জিজ্ঞাসা করিয়া জানা যাইল যে তিনি ভিখারিণীর কন্যা। এঘরে ওঘরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খাইতেন। সেই স্বভাব এখনও রহিয়াছে। ‘স্বভাবস্তু দুরতিক্রমঃ।’

শ্রীকৃষ্ণের ছলনা

স্যমন্তক মণি হারাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ উহা সত্যভামার গলায় রহিয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য বলরামের সঙ্গে যাইলেন। দূরে সত্যভামাকে দেখিয়া বলরাম বলিলেন, ‘‘ওই যে সত্যভামা, দেখো!” হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ‘‘দাদা! ওই দেখো আকাশে একটা গরু কেমন লাফাচ্ছে!” স্ত্রীলোক কৌতূহলী হয়। সত্যভামা গলা উঁচু করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ‘‘কোথায়, কোথায়?” তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গলা দেখিতে পাইলেন। বলরাম বলিলেন, ‘‘ভাই, এরূপ ছলনা করিতেও জান!” শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ‘‘দাদা, কত ছলনা করেছি! ভাবলুম সেসব হয়তো ভুলে গেছি। তাই দেখলুম এখনও পারি কি না।” *(ক্রমশ)*